তারিখ ... 21 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

ডা. এস এম মোস্তফা জামান ▷

৭২ বছরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে এই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া রক্তাক্ত আন্দোলন ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বদরবারে স্থান করে নিয়েছে। আর ভাষা আন্দোলনের যুগপৎ হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দিয়েছিল এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছিল

চিকিৎসাবিজ্ঞানবিষয়ক বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ডিএমসি)। মেডিক্যাল শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসাসেবার ব্রত নিয়ে ১৯৪৬ সালে মাত্র ১০১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর যাত্রা শুরু। আজ সাড়ম্বরে সেই প্রতিষ্ঠান পালন করতে যাচ্ছে ৭২তম ডিএমসি ডে।

ঢাকা মেডিক্যালের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত সেই ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সব আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল এই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে, সেই দিবসটি অর্জনের পেছনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ৪ জানুয়ারি সফল ছাত্র ধর্মঘট হয়। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে পাকিস্তান সরকার। সেদিন সকালে ঐতিহাসিক আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে যেখানে নতুন অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে) প্রতিবাদী ছাত্রদের সভার পর ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল শুরু হয় এবং পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে। মেডিক্যালের ছাত্ররা লাশগুলো বর্তমান ডিসেকশন হলের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন পরদিন জানাজার জন্য। কিন্তু রাতেই পুলিশ তা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে গোপনে দাফন করে।

২১ ফেব্রুয়ারি রাতেই তৎকালীন ছাত্রসংসদের সভাপতি গোলাম মাওলার কক্ষে আব্দুল মতিন, অলি আহাদসহ অন্যান্য ব্যারাকবাসী ছাত্রদের উপস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যেই ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ব্যারাকের সব ছাত্র-ছাত্রীর শ্রমে তৈরি হয় সাড়ে ১০ ফুট উঁচু ও ছয় ফুট চওড়া স্মৃতিস্তম্ভ। কলেজ প্রাঙ্গণে জমা করা কলেজ ভবন সম্প্রসারণ কাজের জন্য ইট, বালু ও সিমেন্ট দিয়েই তৈরি হয়েছিল এটি। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন ছাত্ররা স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা চিকিৎসক, তৎকালীন ছাত্র, কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের অনেকেই অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা দুই ভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। এক ভাগে যাঁরা ওই সময়ে কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তৎপরতা, আরেক ভাগে এই কলেজ থেকে পাস করা চিকিৎসকদের একটি অংশ, যারা অন্যান্য হাসপাতাল ও সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে কর্মরত ছিল এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছে।

এই কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মোয়াজ্জেম হোসেন, সেলিম আহমেদ, আলী হাফিজ সেলিম, আবু ইউসুফ মিয়া, ইকবাল আহমেদ ফারুক, মুজিবুল হক, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মোজাফ্ফর, আমজাদ হোসেন, ওয়ালিদ, ওসমান, গোলাম কবীর, জিল্লুর রহিম, ডালু নুরুজ্জামান, শাহাদত প্রমুখ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই ঢাকা শহর কমান্ডের তত্ত্বাবধানে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র শহরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ বর্তমান শহীদ ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে রাজাকারদের ওপর হামলা চালান।

এই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী নিপা লাহিড়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাওয়ার পথে ফতুল্লায় নিহত হন। এক ছাত্র সিরাজুল ইসলাম রাতে হোস্টেলে না গিয়ে হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডে ঘুমাতেন। কিছু স্বাধীনতাবিরোধীর সহায়তায় তাঁকে ১১ ডিসেম্বর রাতে রাজাকার বাহিনী ক্যান্সার ওয়ার্ড থেকে তুলে নিয়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তৎকালীন সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের সদস্যদের মধ্যে স্কোয়াড্রন লিডার এম শামসুল হক, মেজর খুরশীদ, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ মল্লিক, ক্যাপ্টেন মোশারেফ হোসেন, ক্যাপ্টেন আ. মান্নান, লে. আখতার, লে. নুরুল ইসলাম প্রমুখ কর্মকর্তা বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মেজর খুরশীদ 'বীর-উত্তম' ও লে. আখতার 'বীরপ্রতীক' উপাধি পেয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের যেসব সদস্য শহীদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডা. লে. কর্নেল এ এফ জিয়াউর রহমান, ডা. মেজর আসাদুল হক, ডা. লে. আমিনুল হক, ডা. লে. খন্দকার আবু জাফর মো. নুরুল ইমাম প্রমুখ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেরই ছাত্র ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত প্রায় সব চিকিৎসকই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা আসল নাম গোপন রেখে হাসপাতালে ভর্তি হতেন। হাসপাতালে এসব কাজে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতেন অধ্যাপক ফজলে রাব্বী। তিনি তাঁর আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা অনেক চিকিৎসক ভারতে গিয়ে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকে দেশে ফিরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছেন। আবার কেউ আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসা করেছেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন ডা. শিশির মজুমদার, ডা. সরওয়ার আলী, অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ডা. মাকসুদা নার্গিস, ডা. কাজী তামান্না, ডা. ফৌজিয়া মোসলেম, ডা. সমীর কুমার শর্মা প্রমুখ। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগই ভর্তি হয়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তৎকালীন ছাত্র ও চিকিৎসকরা বিভিন্নভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছিলেন।

যাঁরা শহীদ হয়েছেন

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা চিকিৎসরা হলেন ডা. মো. ফজলে রাব্বী, ডা. লে. কর্নেল এন এ এম জাহাঙ্গীর, ডা. মো. আব্দুল আলীম চৌধুরী, ডা. মেজর রিয়াজুর রহমান, ডা. মো. শামসুদ্দিন আহমেদ, ডা. আজহারুল হক, ডা. মেজর এ কে এম আসাদুল হক, ডা. এ বি এম হুমায়ুন কবির, ডা. লে. খন্দকার আবু জাফর নুরুল ইমাম, ডা. সোলায়মান খান, ডা. লে. মো. আমিনুল হক, ডা. গোলাম মর্তুজা, ডা. আব্দুল জব্বার, ডা. নরেন ঘোষ, ডা. জিকরুল হক, ডা. গোপাল চন্দ্র সাহা, ডা. লে. কর্নেল এ এফ জিয়াউর রহমান, ডা. হাসিময় হাজরা প্রমুখ। তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মো. সিরাজুল ইসলাম, নিপা লাহিড়ী, মো. হুমায়ুন ফরীদি, মো. হাসান শহিদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে এই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া রক্তাক্ত আন্দোলন ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বদরবারে স্থান করে নিয়েছে। আর ভাষা আন্দোলনের যুগপৎ হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দিয়েছিল এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছিল। এসব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দেওয়ারও দাবি জানাচ্ছি, যা খুব যৌক্তিক।

লেখক : কে-৪৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী। অধ্যাপক, হৃদরোগ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
drsmmzaman@yahoo.com
অনুলিখন : আতাউর রহমান কাবুল